আদিমধ্য যুগে দেশীয় [illegible] বাণিজ্য

আদিমধ্য যুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসে দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও ড. শর্মা ও যাদব এযুগে বাণিজ্যের অবক্ষয়ের তত্ত্ব তুলে ধরে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে এযুগে বাণিজ্যের অবক্ষয়ের জন্য নগরগুলির অবক্ষয় ঘটেছিল। কিন্তু আদিমধ্য যুগের কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে দেখা যায় এযুগে (৬০০-১৩০০ খ্রিস্টাব্দ) অর্থনৈতিক চরিত্রে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটেছিল কিন্তু সামগ্রিকভাবে কৃষি-শিল্প-বাণিজ্যের অবক্ষয় ঘটেছিল এ তত্ত্ব আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম গবেষক ড. ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ও চম্পকলক্ষ্মী মেনে নিতে পারেননি। তাঁদের মতে আদিমধ্য যুগে অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বহু পরিবর্তন ঘটেছিল কিন্তু বাণিজ্য নির্ভর নগরাশ্রয়ী অর্থনীতির অবসান ঘটেনি। তাঁদের ব্যাখ্যায় এযুগের অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিবর্তে এক সজীব ও সৃজনশীল অর্থনৈতিক চিত্রই পাওয়া যায়। এযুগে সামন্ততন্ত্রের অভিঘাতে যাঁরা অর্থনৈতিক জীবনে সঙ্কট দেখেন তাঁদের মতে দেশীয় ও দূরপাল্লার বাণিজ্যের সঙ্কোচন ঘটেছিল। কিন্তু আগেই বলেছি ড. চট্টোপাধ্যায় ও চম্পকলক্ষ্মী এই মতের চরম বিরোধিতা করেছেন। এখন সাম্প্রতিক তথ্য ও গবেষণার আলোকে দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যধারা আলোচনা করলে দেখা যাবে এযুগের অর্থনৈতিক ইতিহাসের প্রকৃত বাণিজ্যিক চরিত্র কেমন ছিল।

ভারতবর্ষ সুপ্রাচীনকাল থেকে যে শিল্পে ও বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল তা বহু তথ্য থেকে আমরা জেনেছি। এমনকি *শতপথ ব্রাহ্মণেও* সমুদ্রযাত্রার কথা উল্লেখ আছে। *পেরিপ্লাস* থেকেও ইওরোপের সঙ্গে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ এক বাণিজ্যধারার বিবরণ পাই। গুপ্তযুগে নির্মিত মেহেরুলি পিলার (দিল্লিতে কুতুবমিনারের সন্নিকটে অবস্থিত) অর্থাৎ এই লৌহ স্তম্ভটি প্রমাণ দেয় ভারতে সে যুগে লৌহশিল্পে কী অভাবনীয় অগ্রগতি ঘটেছিল। বাণিজ্যকে যে ভারত বরাবর উচ্চ মর্যাদা দিয়েছে সে তথ্য পাওয়া যায় সমকালীন সাহিত্যে, তাম্রশাসনে ও বৈদেশিক বিবরণে। আদিমধ্য যুগে মানুষ কৃষিতে আত্মনিয়োগ করলেও বাণিজ্য কখনও অবহেলিত ছিল না। এযুগে দেশীয় বাণিজ্যে বহু প্রকার বাণিজ্যকেন্দ্রের উত্থান ঘটেছিল তা বিভিন্ন তথ্যে পাওয়া যায়। বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি ছোটো, বড়ো ও মাঝারি নানা প্রকারের ছিল। সাহিত্যে ও তাম্রশাসনে 'হট্ট' ও 'হট্টিকা'র ব্যবহার এযুগে ব্যাপক দেখা যায়। এগুলি আজকের গ্রামের 'হাট' বা সপ্তাহে দুবার বা তিনবার বসে। প্রকৃতপক্ষে এগুলি গ্রামীণ ক্ষুদ্র বাজার বা হাট। দক্ষিণ ভারতে তেলেগু লেখতে দেখা যায় অড্ড। এটিও অন্ধ্র এলাকার গ্রামীণ বাজার বা হাট। ড. রণবীর চক্রবর্তী লিখেছেন সংস্কৃতে অন্যসূত্রে 'যাত্রা' নামক যে এলাকা বর্ণিত তা নিশ্চয়ই কোনো কাল্পনিক ঘটনা নয়। এটির অর্থ

Scanned with CamScanner

মেলা ও মেলা চলাকালীন বাজার। উত্তর ভারতে যে মেলা 'যাত্রা' বলে অভিহিত, তার সমতুল্য মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকে 'সন্থে'। হাটের মতোই 'যাত্রা' বা 'সন্থে'তে নিত্য ও নিয়মিত বেচাকেনা চলে না। তার বৈশিষ্ট্য সাময়িক। মেলাগুলি কোনো নির্দিষ্ট দিনে বসত না। উৎসব, অনুষ্ঠান বা ধর্মীয় পরব ইত্যাদির সঙ্গে মেলা বসার নিবিড় সম্পর্ক ছিল। মেলাগুলিতে লেনদেন হত দীর্ঘদিন ধরে। বিশেষ কোনো ঋতুতে অথবা কোনো বিশেষ মাসে বা কোনো ধর্মীয় উৎসবকালে মেলা বসত। নবম শতকের রাজস্থানের লেখতে 'কম্বলা হট্ট' বা ঘোড়া বেচাকেনার মেলা বসত। জীবজন্তু বেচাকেনার মেলা বছরের নির্দিষ্ট দিনে বসত। ওখানে গোরু, মোষ, ষাঁড়, ঘোড়া, উট ইত্যাদির বেচাকেনা হত। পুরানো পশু বেচা বা নতুন পশু কেনার অভিপ্রায়ে বহু দূরদূরান্তর থেকে অসংখ্য লোক আসত।

উত্তর ভারতে মণ্ডপিকা নামে একধরনের বাজারের নাম পাওয়া যায়। ভারতের অন্যত্র মণ্ডপিকা বাজারের অস্তিত্ব দেখা যায় না। সম্ভবত এগুলি হাটের চেয়ে বড়ো। তবে নগরের বাজারের থেকে এগুলি খুবই ছোটো। মণ্ডপিকার অস্তিত্ব দাক্ষিণাত্যে দেখা যায় না। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় অবশ্য তাঁর 'Markets and Merchants in Early Medieval India' নামক এক প্রবন্ধে রাজস্থানে মণ্ডপিকা ও হাটের কথা উল্লেখ করেছেন। হাট ও নগরের মধ্যবর্তী বাজার বা বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে মণ্ডপিকাগুলি অবস্থান করত। আবার মণ্ডপিকাগুলি কোথাও বাণিজ্যশুল্ক আদায়ের কাজ করত। এখন প্রশ্ন তাহলে কি দাক্ষিণাত্যে নতুন একটি বাণিজ্য কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায় যা 'সন্থে' বা 'অড্ড' তুলনায় বড়ো কিন্তু বৃহৎ নগরের বাজারের তুলনায় ছোট। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় ও রণবীর চক্রবর্তী 'পেঠা', 'পিঠা', 'পেংটা' বলে আর একধরনের বাণিজ্যকেন্দ্রের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা যুক্তি হিসাবে দেখিয়েছেন যে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের বহুস্থানের নামের শেষে 'পেঠ' শব্দটি ব্যবহার হতে দেখা যায়। যেমন কাজিপেঠ, নারায়ণপেঠ ও বেগমপেঠ ইত্যাদি। অবশ্য প্রশাসনিক এলাকা হিসাবে 'পেঠ' শব্দটি ব্যবহৃত হত। প্রকৃতপক্ষে 'পেঠ' গ্রাম ও নগরের সংযোগসূত্র হিসাবে কাজ করত এবং বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মে লিপ্ত ছিল। বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের পরিচয় পাওয়া যায় ৯৫৯ খ্রিস্টাব্দে রচিত জৈন লেখক সোমদেব সুরির লেখা *যশস্তিলকচম্পূ* নামক গ্রন্থে। সোমদেব শ্রীভূতি নামক এক ব্রাহ্মণের দ্বারা এক 'পেঠা' প্রতিষ্ঠার বিবরণ দিয়েছেন। শ্রীভূতি যে পেঠাটি নির্মাণ করেছিলেন তা অনেকগুলি কক্ষে বিভক্ত ছিল এবং পেঠাটিতে মজুত রাখার জন্য বৃহৎ কক্ষের ব্যবস্থা ছিল। নানা দেশ থেকে নিয়মিত আসতেন বণিকের দল। এখানে ভোজনালয়, আসনযুক্ত সভাগৃহ, বীথি বা রাস্তা ও দোকান সংযুক্ত হয়েছিল। পেঠাটি আয়তনে প্রায় দু'মাইল। সোমদেব সুরি পেঠাটিতে একটি বাণিজ্যকেন্দ্রের বর্ণনা দিয়েছেন। অন্ধ্রপ্রদেশে কাকতীয় বংশের রাজত্বকালে রাজধানী বরঙ্গলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর লেখতে 'পেংটা' শব্দটি পাওয়া

Scanned with CamScanner

যায় যা পেঠারই সামান্য ভিন্নরূপ। পেংটাগুলি বাণিজ্য শুল্ক আদায় করত এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটাবার মতো লেনদেন হত। এখানে স্বদেশি ও বিদেশি বণিকরা উপস্থিত থাকত।

তবে দক্ষিণ ভারতে উত্তর ভারতের মণ্ডপিকার মতো বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে বিকাশলাভ করেছিল নগরম। চোল লেখমালায় বহু নগরম-এর উল্লেখ আছে। প্রত্যেক নাড়ুতে একটি করে নগরম ছিল। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসাবে গঠিত হত নাড়ু। নগরমগুলি গ্রামের সঙ্গে এবং নাড়ুর সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেনের কাজ করত। তবে সব নাড়ুতে সম্ভবত নগরম ছিল না। স্থানীয় বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে চোল শাসিত দাক্ষিণাত্যে সক্রিয় ছিল নগরমগুলি।

বাংলায় স্থানীয় বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে হট্ট বা হাটের অস্তিত্ব তাম্রসূত্রে খুঁজে পেলেও মণ্ডপিকা বা পেঠার অবস্থিতি খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে ড. রণবীর চক্রবর্তী দেখিয়েছেন যে পূর্ববঙ্গের ৯৭১ খ্রিস্টাব্দের চন্দ্রবংশীয় রাজা শ্রীচন্দ্রের একটি তাম্রশাসনে সম্ভাণ্ডারিয়াক শব্দটির উল্লেখ আছে। সম্ভাণ্ডারিয়াক শব্দের অর্থ যেখানে পণ্যসামগ্রী মজুত করার ব্যবস্থা আছে। সম্ভাণ্ডারিয়াক বোধহয় মণ্ডপিকা বা পেঠার মতোই গ্রাম ও নগরের মধ্যবর্তী মাঝারি আয়তনের এক জাতীয় বাণিজ্যকেন্দ্র। তবে নদীমাতৃক বাংলায় নদী বন্দরগুলি সম্ভবত গ্রাম ও নগরের বড়ো বাজারের সঙ্গে প্রধান যোগসূত্রের কাজ করত। এযুগে দেবপর্বত এমনই একটি প্রাণবন্ত অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর। দেবপর্বত বন্দরকে বাংলাদেশের ময়নামতীর সঙ্গে শনাক্ত করা হয়েছে। দেবপর্বত ক্ষীরোদা নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ক্ষীরোদা নদীর উভয়তীরে বহু জলযানের ও নাবিকের সমাবেশ ঘটেছিল। তাম্রশাসনগুলিতে দেবপর্বতের সুন্দর বর্ণনা পাওয়া যায়। দেবপর্বত একটি গুরুত্বপূর্ণ বাংলাদেশের নদীবন্দর হিসাবে কাজ করত। এসময়ের অনেক নদী বন্দরের নাম পাওয়া যায়। অভ্যন্তরীণ ও স্থানীয় বাণিজ্যে এই নদী বন্দরগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। এই নদীবন্দরগুলি আদিমধ্য যুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ বেলাকুল বা বন্দর। ড. রণবীর চক্রবর্তী বিভিন্ন তথ্য দিয়ে দেখিয়েছেন অভ্যন্তরীণ নদী বন্দর ও নদী পথগুলি বাংলার অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। তাঁর মতে নবম ও দশম শতক হতে বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক বাণিজ্যে বাংলার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। তাছাড়া লহড়চন্দ্রের একটি তাম্রশাসনে ধৃতিপুরের 'হট্টক' উল্লেখিত হয়েছে। স্থানটির নামের শেষে 'পুর' শব্দটির প্রয়োগ এবং এর সঙ্গে আবার 'হট্টক' বা 'হাট' শব্দটির সংযোগ নিঃসন্দেহে এর নাগরিক ও বাণিজ্যিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ইঙ্গিত দেয়।

তবে বাংলার এযুগের বাণিজ্য সম্পর্কে ড. তরফদার মনে করেন খ্রিস্টীয় সাত শতক থেকে শুরু করে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ব্যবসা-বাণিজ্যের বিশেষ কিছু জানা যায় না। এই সময় মুদ্রার প্রচলন হ্রাস পেয়েছিল এবং সেন আমলে মুদ্রার প্রচলন প্রায়

Scanned with CamScanner

বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কেননা এযুগের কোনো মুদ্রাই পাওয়া যায়নি। ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ কড়ির মাধ্যমে চলত। একথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে *তাবাকৎ-ই-নাসিরী*তে। সেইজন্য মনে হয় এযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিশেষ করে সমুদ্র বাণিজ্যে ভাটা পড়েছিল। আবিষ্কৃত তাম্রশাসনগুলিতে যে সমাজব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তাতে বণিকদের তেমন স্থান নাই। এমনকি বল্লালসেনের একটি তথ্য থেকে জানা যায় যে তিনি সুবর্ণ বণিকদের পংক্তিচ্যুত করে নিম্নশ্রেণীর জাতিতে পরিণত করেছিলেন। এই তথ্যের যদি বিন্দুমাত্র সত্যতা থাকে তাহলে বুঝতে হবে বণিকদের সঙ্গে রাজশক্তির দ্বন্দ্ব হয়েছিল এবং এই দ্বন্দ্বের ফলে বণিকদের দুর্দশা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাই কেউ কেউ বলেছেন পাল-সেন আমলে সমাজ পুরোপুরি কৃষিভিত্তিক হয়ে পড়েছিল। যদিও নিঃসন্দেহে তথ্যের অভাবে এই মত পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। তবে মুসলিম অধিকারের পূর্ববর্তীকালে বাংলায় যে একটি বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে ড. তরফদার যে মতই পোষণ করুন সম্ভবত একথাই যথার্থ যে পট্টিকেরা, দেবপর্বত ও চট্টগ্রামের রামুর নিকটবর্তী কোনো বন্দরই ছিল বোধহয় গুপ্ত আমল থেকে শুরু করে মুসলিম আগমন পর্যন্ত এ অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। প্রাক-মুসলিম যুগে হরিকেল, সমতট ও বঙ্গ একত্রভাবে ছিল একটি অর্থনৈতিক ইউনিট যার অংশগুলো নদীপথ ধরে পরস্পরের মধ্যে অনবরত যোগাযোগ করে চলত। ক্ষীরোদা নদী ময়নামতীকে পরিখার মতো ঘিরে রেখেছিল। কিছু সংখ্যক তাম্রলিপিতে উল্লিখিত 'সার্থবাহ', 'নগরশ্রেষ্ঠী' ও বণিক শ্রেণীর উল্লেখ আছে। শব্দগুলি নগর সভ্যতার দ্যোতক। উত্তর ভারতে এরকম বণিকদের সংগঠন পাওয়া না গেলেও দক্ষিণ ভারতে কোলাপুর, মিরাজ ও বেলগাঁওতে বণিকদের সমাবেশ ঘটত। রাজস্থান, গুজরাট ও কোঙ্কন থেকে বণিকরা এখানে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আসত এবং এখানে থেকে বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ পরিচালনা করত। এইসব বণিকদের পরিচয় ও নামের তালিকা পাওয়া গেছে। এইসব বণিকরা পণ্যসম্ভার নিয়ে আসত এবং সেগুলি বিক্রি করে তারা স্বগৃহে ফিরে যেত। তবে লেখ থেকে জানা যায় যে শাসকরা এই সব বণিকদের নিরাপত্তার বিধান করতেন।

বাংলায় অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নদীপথ বা নদীবন্দরগুলি যোগসূত্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। ভারতের অন্যান্য স্থানে জলপথের থেকে স্থলপথ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করত। রাস্তাঘাট সুরক্ষিত ছিল। এসময় স্থলপথের বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এসময় গাধা বা উটের পিঠে করে পণ্যসম্ভার একস্থান হতে অন্য স্থানে বণিকরা নিয়ে যাতায়াত করত। তবে গোরুর পিঠে মালবহনের রীতি ভারতের বহু প্রাচীন ঐতিহ্য। রাজস্থানে প্রাপ্ত লেখ থেকে ড. চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন গোরুর পিঠে পণ্যসম্ভার বহন করে বাণিজ্যিক লেনদেন বহুদূর পর্যন্ত চলত। ইরফান হাবিব যে 'বানজারা'র কথা বলেছেন তা রাজস্থানে আদিমধ্য যুগেও প্রচলিত

Scanned with CamScanner

ছিল। এক একটি শস্য বহনকারী বৃষের দলে ব্যবসার কাজে শত সহস্র বৃষ বহাল রাখত। একসঙ্গে এই বৃষের দলটি পিঠে করে মাল বহন করে এক স্থান হতে বহুদূর স্থানেও নিয়ে যেত। পথে নিরাপত্তার জন্যই একসঙ্গে দল বেঁধে এই 'বানজারারা' গমনাগমন করত। তাদের সুবৃহৎ শস্যবহনকারী শকটের জন্য অনেক সময় ৪০,০০০ পর্যন্ত বলদের প্রয়োজন হত।

হিউয়েন সাঙ (৬৩০-৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ), কিয়াতানের চীনা বিবরণ (৭৮৫-৮০৫ খ্রিস্টাব্দ), আলবেরুনি (জন্ম ৯৭০-৭১—মৃত্যু ১০৩৮-৩৯ খ্রিস্টাব্দ) এবং নবম শতকে সুলেমান, রুহমির এবং অল্-ইদ্রিস ও অল্-মাসুদি (৯১৫ খ্রিস্টাব্দ) এযুগের বেশ কয়েকটি স্থলপথ ও জলপথের উল্লেখ করেছেন। স্থলপথগুলি দেশের বাণিজ্য সংযোগের ক্ষেত্রে শিরা-উপশিরার কাজ করত। পথ কর তখন আদায় করা হত। রাস্তাঘাট বণিকদের কাছে সুরক্ষিত ছিল। কারণ দক্ষিণ ভারতের লেখতে একটি বাণিজ্যিক সংগঠনের সদস্যদের সশস্ত্র প্রহরা দিয়ে তাদের নিরাপত্তা বিধানের কথা উল্লেখ আছে। উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্র কনৌজের সঙ্গে অন্যান্য স্থানের যোগাযোগের কয়েকটি স্থলপথের কথা আলবেরুনি উল্লেখ করেছেন। তবে এই পথগুলি কীভাবে বাণিজ্যের কাজে ব্যবহৃত হত তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। স্থলপথে ও জলপথে যে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য সজীব ছিল তা এই তথ্য থেকে জানা যায়। যদিও রামশরণ শর্মা এযুগের বাণিজ্যে অবক্ষয়ের চিত্র তুলে ধরেছেন। কিন্তু অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় তাঁর "Commerce and Money In Western And Central Sectors of Eastern India" নামক প্রবন্ধে মধ্য ভারতের বহু বাণিজ্য কেন্দ্র ও বণিকদের কার্যকলাপের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

Scanned with CamScanner